OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 359 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 359 - 365
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আনোয়ারা সৈয়দ হকের কথাসাহিত্য : নারী বিদ্রোহ ও পর্যবেক্ষণ

শাহমুব জুয়েল
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
গল্লাক আদর্শ ডিগ্রি কলেজ, চাঁদপুর, বাংলাদেশ
Email ID: shahmubjewel@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Contribution of women, Student politics, Sunset law, Chromosome, Religious belief, Rights, Racticing modesty.

Abstract
There is scrutinized observation of contemporary women and society in Anwara Syed Haque's literary work. It is perfectly mingled united in fiction. Her narratives skillfully intertwine feminist perspectives with the concept of rebellion, presenting it in a contextually relevant and renewed form. Because the root crisis of social degradation is the humiliation of women and the social deprivation. Even, to represent and consider women in a different way is the patriarchal vision. In recent scenario, there are unrestricted conflicts and lacks between men and women. developments, there is a visible and unrestricted conflict between men and women. There are ingrained patriarchy, carnal thinking, and regressive traditions. Even state agents, republic officials, and so-called progressive individuals are not moderate, rather, they take women for consuming goods. They are not acknowledged equally; even, they will be capable of keeping contributions if the access to work and a conducive environment are assured, but, to subdue is the fairest conclusion so that they can never be rebellious because the existing material structure will be broken down if they rise their voices. In this case, various material and moral restrictions are being systematically imposed upon women that are counted as two ways of getting redemption from the men's lust. There is multiple shortages of confidence and fidelity of the men to the working and laboring women in the country. Men attempt to disgrace women in multiple ways, often using fear—both worldly and spiritual. Out of fear of women becoming equal partners, efforts are made to push them back. Yet, if women are allowed equal footing and presence, both domestic and social spheres could experience genuine social and economic liberation. Both rural and urban societies are now under the pressure of foreign ideologies, distorting local cultural perspectives and promoting indecent views of women. The foundation of society is human. Human-centric polarization is inherently relative. If women become courageous and aware, it would challenge the very audacity to produce obscene media or perpetuate exploitation; the rebellion of women is the

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 359 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

demand of the time. Feminist thought and rebellion are real commentary in her literature, presenting the events that awakened women's society in which the unprotected lives of many women have been outlined. The rebellious thought and the real scenario of the women society are held by illustrating the complete fiction.

Discussion

নারীর মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে কথাশিল্পী অত্যন্ত সচেতন এবং যত্নবান। নারীর সার্বিক উন্নতির জন্য সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো নানান কর্মসূচি গ্রহণ করলেও বাস্তবতা যে ভিন্নরকম তা লেখকের উপলব্ধিগত বিষয়। বাংলাদেশের নারীসমাজ বৈশ্বিক চিন্তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়নি বরং অবিশ্বাস ও বিকৃত রুচিবোধ তৈরি হয়েছে। কথাকার বাস্তবতা অনুধাবন করে অগ্রগতির অন্তরায়ের নানাবিধ বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁর *ব্যবহৃতা* উপন্যাসে। উপন্যাসটি সমীক্ষাধর্মী। নারীর প্রতি পুরুষের কামুক ভাবনা কতটা ভয়ংকর ও অমানবিক এবং আর্থিক উন্নতিই যে সবকিছু তা উল্লেখ করেন শাবনুর চরিত্রের মাধ্যমে। যার ভাষ্য এরকম -

> "আপা আল্লায় এই কুত্তাগো হাতে টাকা দিয়া পাঠাইছে। মহিলারা অনেক ভালা। আজ আপনে যদি আপনার স্বামীর সমান কামাই করতেন, তো তাইলে দেখতেন আপনার স্বামী আপনারে কত ডরায়। আসলে আপা মানুষ ডরায় পয়সারে। পয়সা যার থাকবো মানুষ তারেই ডরাইবো। এই যেমন আমি বাড়িত টাকা পাঠাই, ভাই সবাই আমারে ডরায়। কেউ জিগায় না, শাবনুর কই পাইছোস এতো ট্যাকা?"[১]

বিচার প্রার্থনা করাই নারীর প্রধান কাজ। সমাজে বিচারকার্য পরিচালনা করে পুরুষসমাজ। পুরুষের কাছেই নারীসমাজ অরক্ষিত। তারা হবে বিচারক, এ যেন লেখকের কাছে পরিহাসের বিষয়। সময় বিবেচনায় প্রশাসন ও দাপ্তরিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা বিদ্যমান। আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষের সম্পৃক্ততা। দু-একজন নারী যোগ দিলেও তাতে তেমন ফল হয় না। নারীকে হীন চোখে উপস্থাপন করা হয়। গ্রাম ও শহর দুই স্থানে নারীর অধিকার নিয়ে কথা হয়, গোলটেবিল বৈঠকেও ঝড় ওঠে। আজকালকার এই ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী বর্তমান অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ। নারী-পুরুষ কল্যাণরূপে সৃষ্টি হলেও সমাজ-সংসারে নারীর প্রতি সহিংসতা কমেনি। নিম্নশ্রেণি থেকে শিক্ষিত, ধর্মানুরাগী কেউ বাদ নেই; অধিকাংশই সংহিসতায় জড়িত। নারী রাস্তায় বের হলেই সর্পদৃষ্টি থাকে নারীর মুখশ্রীতে। নারীর প্রতি বিদ্বেষই এক ধরনের উচ্চ মানসিকতায় রূপ নিচ্ছে। প্রেমিকা, স্ত্রী, মা, বোন কেউই রক্ষিত নয়। অরক্ষিত জীবনের বাঁকে নারী পুরুষের কাছে সম্পূর্ণ জিম্মি ও পিষ্ট। পুরুষের উক্তি হচ্ছে 'মেয়েমানুষ'। 'আমি, শর্মিলা ও বর্ণা' গল্পের চরিত্রগুলো সময়ের সৃষ্টি। সভ্যতা ও আধুনিক চিন্তার মধ্যে তিনি নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'পাখির পালক' গল্পে পতিতা শ্রেণির আত্মদহন ধারণ করা হয়েছে। গল্পে ফুলবানু পতিতা হলেও শওকতকে ভালোবেসে বাচ্চা ধারণ করে কিন্তু শওকতের অস্বীকৃতি পুরুষতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ। গল্পের বর্ণনা এরকম -

> "আমার বাচ্চা তুমি জানলে কী করে? এ প্রশ্নের কী উত্তর হয়? ফুলবানু হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। উত্তর না দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র টানাটানি করতে লাগলো। যেনো নারীত্বের অভিমানে আঘাত লেগেছে জোরে। শওকত হঠাৎ করে বিছানায় উঠে বসে, ভাবছো আমারে ব্লাকমেইল করবা?"[২]

দেশের বহু বিষয়ে পরিসংখ্যান হয় কিন্তু নারী নির্যাতন তথা স্ত্রী পেটানো স্বামীদের পরিসংখ্যান সীমিত। অথচ সমাজে অধিকাংশ স্বামী বউদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। নিজের স্ত্রীর ন্যূনতম স্বকীয়তা-স্বনির্ভরতা দেখলে বিষফোঁড়া মনে করে। স্ত্রীকে দমানোর ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। কোনো কোনো পরিবারে বউ পেটানো উত্তরাধিকার সূত্রেও প্রাপ্ত ঘটনা। বাপদাদার আমল থেকে এসব চিত্র দেখা যায়। বিশেষ করে নারী যখন গর্ভবতী ও বাচ্চাকাচ্চা ছোটো থাকে তখন নারীর প্রতি সহিংসতা প্রবল হয়ে ওঠে। লেখকের দৃষ্টিতে নারী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষের মানসিকতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি যৌক্তিকভাবে আলোচনা করেছেন এ সমাজে বিয়ের আগে নারীর প্রতি মায়া-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 359 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রেম ও মোহ আকৃষ্ট চেতনা থাকলেও বিয়ের পর দিনদিন পুরুষের মূল চরিত্র প্রকাশ পায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দেওয়াল ভাঙার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সোচ্চার।

সন্দেহ উপন্যাসে তিনি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিকোণ এবং সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভালোবাসার ঘটনাচক্র বিবৃত করেছেন। মনোরোগবিশেষজ্ঞ রাজিয়া বানুর চারপাশে মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেশি, যাদের জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর কাজ ও সমীক্ষা। অন্যদিকে মাহবুব চরিত্রের মাধ্যমে নারীর প্রতি বিষোদ্গার স্পষ্ট হয়েছে। শৈশবে মাহবুব মাতৃহীন হয়। মা জৈবিক চাহিদা পূরণে পরপুরুষের সঙ্গে বসবাস শুরু করে। মাহবুবের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার ও মায়ের মমতাবঞ্চনা। 'অসতী মায়ের পুত ভালো হইবো ক্যামনে'। ধীরে ধীরে তার ঘৃণা তৈরি হয়। সে যখন অর্পিতাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পায় তখনই ভেতরে ভয় তাড়া করে। অর্পিতাও কি তাকে ছেড়ে যাবে? সন্দেহ ও নারী-জীবনজিজ্ঞাসা তাকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করে। সন্দেহপ্রবণতা এক ধরনের রোগ। *ওথেলো* নাটকে ড্যাসডিমোনার প্রতি ওথেলোর সন্দেহ, রবার্ট ব্রাউনিঙের প্রোফাইরিয়ার প্রেমিক প্রেমিকাকে একান্তভাবে পেতে তাকে হত্যা করেছিল, তা ভালোবাসা নাকি সন্দেহ সিন্ড্রম? পেশাগত জীবনে সমুজ্জ্বল হলেও ব্যক্তিগত জীবনে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটে রাজিয়া বানুর জীবনে। তিনি নিজের জীবনের পাশাপাশি সমীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের অসহায়ত্ব, নৃসংশতা, পাশবিক হত্যা, চারিত্রিক স্খলন নিজস্ব বয়নে তুলে ধরেছেন। আশীর্বাদ ও আশাবাদী চিন্তার বাইরে এক অভিনব বাঙালি নারীর মন অনুসন্ধানের চেষ্টা করছেন। এখানে অর্পিতা ও মাহবুবের সমীক্ষা দারুণভাবে উল্লেখিত হয়েছে। অর্পিতা যখন মাহবুবকে নপুংশক বলে তখন ক্ষোভ তৈরি হয়, হত্যাকাণ্ড ঘটে, মাহবুব কর্তৃক অর্পিতা খুন হয়। মাহবুবকে বিচলিত দেখা যায়। সন্দেহের গুটিগুলো তৈরি হয়ে বেশ কয়েকটি সংসার ও সাজানো জীবনের ভাঙনের প্রকাশ ঘটে। কখনও কখনও ফ্রয়েডীয় চিন্তা কাহিনিকে গতিময় করে। এসব চিত্রায়ণের মাধ্যমে নারীর প্রতি পুরুষশ্রেণির বিকৃতরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

সাংসারিক জীবনে সমবণ্টন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংসারযাত্রায় নারী-পুরুষের সমকক্ষতা তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের নারীরা সমভাগ বিষয়ে সচেতন নয়। মায়েরা সংসারজীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহায়। রাতদিন পরিশ্রম করে সন্তানের সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে দৈনন্দিন জীবনে নানা কিছু থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। বাংলাদেশি মায়েদের মাঝে কমনীয়তা বেশি। ছেলে, স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের কথা মাথায় রেখে সমভাগ গ্রহণ করে না; নিরপেক্ষ থাকে। অন্যদের খাবার পরিবেশন করে জীবন অতিবাহিত হয়। সংসারের সকল কাজকর্ম সেরেও খাবারটা মুখে নেয় না; অবশিষ্ট অংশ খেয়ে কোনোরকম জীবনযাপন করে। মা মনে করে ছেলে-মেয়ে-স্বামীর খাদ্যের যথাযথ ভাগ তুলে রাখা হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য। নিজের ভালো খাবার গ্রহণের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও খেতে পারে না। চারপাশের সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশ দৈনন্দিন জীবনে তা শেখায়। নিজেকে বুভুক্ষু, অনাদৃত, বঞ্চিত ও মাতৃত্বের জয়গানে বিভোর হয়ে ওঠে। নিজের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছা নেই কিন্তু তাদের আছে। জীবন ও অস্তিত্বের মধ্যে ডুবে থাকে এবং সার্বিক অধিকার প্রয়োগ করে। সংসারজীবনে আত্মত্যাগের কথা কেউ মনে রাখে না, কারণ সন্তান বড়ো হওয়া পর্যন্ত মায়েরা একই কথা উপস্থাপন করেছে— তাদের কাছে কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই। অথচ দুর্দিনে বেঁচে থাকার জন্য অবলম্বন দরকার। সেক্ষেত্রে বিনিময় শেখানো আবশ্যক। বিনিময় সম্পর্কে ধারণা তৈরি না হলে পারস্পারিক সম্পর্ক অটুট থাকবে না; সন্তানরা হয়ে ওঠে স্বার্থপর দানব। ছেলেবেলায় সমবণ্টনের পদ্ধতি শেখাতে না পারলে মানুষ অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে না। বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে দয়াময়ী মা হওয়ার পাশাপাশি একজন অধিকারসচেতন মানুষও হওয়া প্রয়োজন।

নারী চরিত্র তাঁর উপন্যাসে নানাভাবে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারী অসামান্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে। *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসের প্রফুল্ল অন্যতম দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে *বিষবৃক্ষ*-র কুন্দনন্দিনী শান্ত স্বভাবের বিদ্রোহী, *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এ রোহিণী উগ্র স্বভাবের। নারীর প্রতি পুরুষের বিদ্বেষ বহুকাল থেকে শুরু। নিরসনকল্পে কোনো বিহিত হয়নি, যা হয়েছে যৎসামান্য। নারী-পুরুষের বিভাজন ও বৈষম্য আদর্শে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে লোকগানে আছে : মেয়েছেলে মাটির ঢেলা/ টপ করে নিয়ে জলে ফেলা। রামের কাছে সীতা খেলার পুতুল তা উল্লেখ করেছেন বেগম রোকেয়া। আনোয়ারা সৈয়দ হক তাঁর লেখায় নারীর মুক্তি বিষয়ে মন্তব্য করেন : নারীরা ফুলের মতো সুন্দর, সৌন্দর্য পিপাসা মেটানোই মনে হচ্ছে নারীর কাজ। শুধু চোখের দেখা নয় ছুঁয়ে দেখা, স্পর্শ করা। এ জন্য লোকালয়ে নারীর গায়ে

পুরুষের হাত পড়ে। মনে হচ্ছে এজমালি শরীর। হাতের ছোবলে কুঁকড়ে যায় কিন্তু ছোবল মারে না, প্রতিবাদ করে না। ছোবলের কোনো সাক্ষী নেই। ছোবলকারী সহজে প্রস্থান করে। আদিম যুগের এমন আচরণ নিয়ে নারীদের পথ চলতে হয়। গরিব দেশে মেয়েদের পথে যেতে হয় স্বামী-সন্তান ও বাবা-মায়ের সংসার রক্ষার তাগিদে। আজকে মানুষের মেধা ও মননের উন্নতি হয়েছে কিন্তু মানসিকতার উন্নয়ন ঘটেনি। মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় নারীসমাজ কুক্ষিগত হচ্ছে। অস্পষ্ট ও বিকৃত চিন্তনে, নিন্দা ও সংকীর্ণতায় হয়ে উঠছে আত্মরক্ষার দুর্গ। সংকটাপন্ন জীবনের পথে শিক্ষার প্রয়োজনও স্পর্শ করেনি। স্বধর্ম ও স্বজাতির বাইরেও নারী জাতির উপর সুকৌশলে রুদ্ধশ্বাস তৈরি করা হচ্ছে। নারীর জীবন-প্রতিবেশ তৈরিতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত সচেতনার পাশাপাশি সামষ্টিক পরিবেশ। নারীর সমাবেশ বিবিধ উপন্যাসে এলেও *নারী বিদ্রোহ* গ্রন্থে বাস্তবতার আলোকে লেখকের জেদ আছে। নারীর অবমাননা যেমন লেখকের কাছে অসহ্য তেমনি নারীর প্রতিবাদ কম থাকায় কড়া সমালোচনাও করেছেন। তার চিন্তা নারীকে জাগ্রত করা। দুর্দিনে ও দুর্ভিক্ষে জীবন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বারবার কড়া কথা উপস্থাপন করেছেন লেখক আনোয়ারা সৈয়দ হক।

জাতীয়তাবোধের অপর নাম সাম্প্রদায়িকতা কেন? সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭৩) গ্রন্থে। বঙ্কিমের *বঙ্গদর্শন*-এ বলা হয়েছে : এ দেশের অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান, বহুবিবাহ রোধ হলে উভয়েরই হওয়া উচিত। জাতীয়তাবাদ উদ্বেগটা এখানে প্রবল হয়ে ওঠে। হিন্দুর জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে মুসলমানরা, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারে লিপ্ত হবে। উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হবে। নারীর দুঃখ অন্বেষণকারী শরৎচন্দ্র। *নারীর মূল্য* প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেন-

> "নারীর মূল্য আসলে নির্ভর করে কী পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীল, সতী এবং দুঃখ-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাহাকে লইয়া কী পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে এবং কী পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে নিবন্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবে।"[৩]

শরৎবাবুর নায়িকা হচ্ছে *শ্রীকান্ত*-র রাজলক্ষ্মী, যার প্রশ্ন হচ্ছে : পুরুষ মানুষ যতই মন্দ হয়ে যাক, ভালো হতে চাইলে ত কেউ বাধা দেয় না কিন্তু আমাদের বেলায় সব পথ বন্ধ কেন? *গৃহদাহ*-র অচলা শহুরে ও আধুনিক মেয়ে কিন্তু রুগণ স্বামীর সেবা করতে তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই। *চরিত্রহীন* উপন্যাসে সাবিত্রীর কথা লক্ষণীয়, যে দেহ দিয়ে সতীশের পূজা করতে চায় না। এ সম্পর্কে লেলিন বলেন : সমস্ত মুক্তিদায়ী সত্ত্বেও মেয়েরা সাংসারিক দাসীই থেকে যাচ্ছে। ...খুদে সাংসারিক গৃহস্থালি তাকে দাবিয়ে রাখছে, বেঁধে রাখছে, শ্বাসরুদ্ধ করছে, বিমূঢ় করছে, হীন করে রাখছে। রবীন্দ্রনাথও মেয়েদের জয়ী করেছেন। প্রিয়া-মাতা-রমণীই নারীর শ্রেষ্ঠত্ব। অমিতের পাশে লাবণ্য মৌলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে বদ্ধপরিকর ছিলেন লেখক। সমাজের বাস্তব অবস্থা মেয়েদের পক্ষে নয়। এহেন সমাজব্যবস্থার মধ্যে বৈষয়িক নানা কিছু রয়েছে কিন্তু ইহজাগতিক চিন্তার বাইরে। অধিকাংশ বাঙালির মধ্যে নারীবিদ্বেষী চিন্তা রিপুগত। নারী-পুরুষের দ্বান্দ্বিক মতামত বিদ্যমান। প্রতিবাদের ধারণা যতই বৃদ্ধি হোক, চিন্তার সৌকর্য বৃদ্ধি পায়নি। নারী-পুরুষের সহাবস্থানে দরকার নৈতিক ও সমবণ্টনের আত্মপ্রেম।

বিষয় ভাবনার দিক থেকে উপন্যাসের কাঠামো বিন্যাস ও সৃষ্টিশৈলীর সার্থকতা ভাবাবেগের আতিশয্য। সাহিত্যশিল্পীরা তাদের স্বকীয়তা দিয়ে সমাজ, দেশ ও পারিপার্শ্বিক জীবন এবং জগতের বিবিধ অনুষঙ্গ লিপিবদ্ধ করেন। বিচ্ছিন্ন সমাজ-সত্য ও সংবেদনা আত্মজাগরণের অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রন্থিত হয়। রাষ্ট্র নানা ভাগে বিভক্ত, রাষ্ট্রের মানুষগুলো অবক্ষয়ী জীবনযন্ত্রণায় বিপর্যস্ত। সমাজের বড়ো ও দায়িত্বশীল অংশ হচ্ছে নারী। তাদের নিগৃহীত রেখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-পরিপার্শ্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৃহত্তর সমাজ মূল্যায়নের সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণও মূল্যায়ন প্রয়োজন। বাংলার জনপদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও তারা নানা উপায়ে বিপর্যস্ত ও বঞ্চনার শিকার। বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী লেখকদের অবদান ও সার্থকতা অনন্য। দেহভঙ্গির কুটিলতাকে ছাপিয়ে লোকমানস ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের নারীর অবদান, নাগরিক ক্লেদ, গ্রামীণ স্নিগ্ধতায় বেড়ে ওঠা ও অন্তরযন্ত্রণা বিশিষ্ট সাহিত্যসম্পদ হয়ে উঠেছে। বৃহত্তর সমাজ ও সমকালকে ধারণ করা এবং নারী জাগরণের অংশীদার হয়ে ওঠে সেলিনা হোসেনের *গঙ্গা* (১৯৭৩), *হাঙর নদী গ্রেনেড*

(১৯৭৬), *জলমগ্ন বিলাপ* (১৯৯৫), *বিষণ্ন আঁধার* (২০০৪); রিজিয়া রহমানের *ঘরভাঙা মানুষ* (১৯৭৪), *একাল সেকাল* (১৯৮০), *রাবেয়া খাতুনের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৫), *ছায়াসঙ্গী* (১৯৮৫), *শেষ বিকেলের আলো* (১৯৯৩), *ভালোবাসার ঘর* (২০০৫); আনোয়ারা সৈয়দ হকের *আয়েশামঙ্গল* (১৯৯৯), *নারী : বিদ্রোহ* (২০০০), *নির্জন সরোবর* (২০০৪), *পাহাড়ের স্রোত* (২০০১), *পরবাসিনী* (২০০১); শাহীন আখতারের *তালাশ* (২০০৪); নাসরীন জাহানের *উর্বর সময়* (১৯৮৯), *চন্দ্রাবতীর কথা* (১৯৯৩), *লালসালু নদীর ধারে* (২০১৫) উল্লেখযোগ্য নারী বিষয়ক উপন্যাস। নারীর অধিকার ও বঞ্চনার ইতিবৃত্ত ঔপন্যাসিকরা লড়াই করেছেন শাব্দিক ও ভাবচেতনায়। সমকালীন বিষয়বস্তুকে অনুষঙ্গ করে নারীর ভবিষৎ-সংকট ও উত্তরণের নানা উপায় তুলে ধরেন। তাঁর ভাবনা, মানুষ যতই আত্মকেন্দ্রিক ও জাদুঘরে প্রবেশ করে না কেন মানুষের প্রধান রূপসৌন্দর্য মানুষ। কারণ মানুষের কোনো বিভাজন নেই— পুরুষ হোক বা নারী। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ না থাকলে সমাজ শুধু বিপন্ন হয় না, অন্তরায়ও সৃষ্টি করে।

মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির প্রধায় উপায় হওয়া দরকার মানুষ। কারণ মানুষের আত্মত্যাগেই সমাজ-সভ্যতা গড়ে ওঠে। নারী সেক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অবয়ব। সময় ও সমাজের চরিত্রের বয়ান দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। যখন দেখি ষাটের দশকে লেখা 'আমি, শর্মিলা ও বর্ণ' গল্পের প্রধান চরিত্র নারী। তিন জন নারীর প্রেমিক ফরহাদ। সে তিন জনকেই প্রেমিকা দাবি করে। কিন্তু তারা তিন বোন এবং বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া আধুনিক মেয়ে। উন্নাসিক মানসিকতা মেনে নেয় কীভাবে, তা কি আদৌ সম্ভব! বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি বরং মেয়েমানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া ও সমাজকে দোষারোপ করে। লেখক নারীকে শুধু ভোগ্য হিসেবে নয় দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে। যুদ্ধকালীন ফরহাদের মুমূর্ষু অবস্থায় পাশে দাঁড়ানো ও দেখতে যাওয়া জীবনের পরিধিকে নতুন ভাবনায় উদ্দীপিত করে। নারীর কোনো দেশ নেই, কথা নেই, সমাজ নেই; পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার বাইরে গিয়ে নারী বিদ্রোহ করা কতটা মানসিক দৃঢ়তা তা তিনি তাঁর লেখায় লিপিবিদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের কুমু চরিত্র অনুসরণে নেন মধুসূদন চরিত্রকে, যা কেবল অসাধারণই নয়, ফলপ্রসূ দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ওরফে বিজয়া নিয়েও তাঁর চিন্তাশীল মনোভাব উচ্চকিত। সাহিত্যভুবনে নারী ল্যু সালোমে, পিকাসোর নারীবৃন্দ কেমন এবং ভাবনা-চিত্র-সংলাপ বিদ্রোহে কতটা ক্ষুরধার তা তিনি তাঁর লেখায় নিবিড় স্নেহে সন্নিবেশিত করেছেন, যা পাঠকের ভাবনাকে পালটে দেয়। বলা চলে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক সমাজবিরুদ্ধ সংকটকে যুক্তিগ্রাহ্য করে খণ্ডন করেন। নারীর স্বেচ্ছাবন্দিত্ব থেকে মুক্তির অবিনাশী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক অবয়বের সঙ্গে পরিবর্তনীয়।

ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের উত্থান হলেও অশুভ চিন্তায় ঢেকে আছে সাম্প্রতিক পরিবেশ। ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকায় কেউ কেউ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা প্রেমের ফাঁদ পেতে সম্ভ্রমহানী করছে এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য মফস্বল থেকে বহু মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। পড়াশোনাই যখন মুখ্য তখন নানাভাবে সহপাঠীদের সাহায্য চায় এবং সহপাঠীদের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে নানা কর্মকাণ্ডে জড়ায়। তাদের অংশগ্রহণে শিক্ষাঙ্গন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কিন্তু সহপাঠী কিংবা বিভিন্ন দলের ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তা ভিন্নরকম রূপ নেয়। ছাত্র সংগঠনের নামধারী ক্যাডারগণ বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শ্রেণির অলংকার বিবেচনা করা কতটা হিপোক্রেট চিন্তা তা তাদের দেখেই অনুভূত হয়। যারা বছরের পর বছর ক্যাম্পাসে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দিব্যি আরামে থাকে। নিরীহ ছাত্রীদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে তাদের অভিভাবকও হয়ে ওঠে। সর্বত্র তাদের অবস্থান ও ক্ষমতায়নের প্রভাব বিদ্যমান। খেলার মাঠ, ক্লাসরুম, হলগুলো, শেষ পর্যন্ত তারা দখলে নেয় মেয়েদের কোমল মন। পাপ, কুৎসিত ও মানসিক নীচতারই অংশবিশেষ। কথোপকথনের উসিলায় ছাত্রীর নামধাম জানার আগ্রহ দেখায়। কিন্তু নিজেদের বাঁচাতে বেরসিক মানুষের মতো কোনো কোনো ছাত্রী নিজের নাম প্রকাশ করেনি। ছাত্রনেতারা সর্বস্ব দখলে নিয়ে যখন অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালায় তখন কারও কারও প্রাণও যায়। তবুও কেউ শিক্ষা লাভ করেনি। সবসময় খবর আসে ছাত্রনেতাদের দ্বারা নারী নির্যাতন হয়েছে। বাদ পড়েনি শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষও। ডিগ্রি অর্জন করতে গিয়ে সুপারভাইজার কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার দৃষ্টান্তও কম নয়। শিক্ষাঙ্গন শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিরাপদ স্থান কিন্তু তা এখনও

অনিরাপদ। তাদের নিরাপত্তার জন্য এক হাতে বই অন্য হাতে পিস্তল, কী অবিশ্বাস্য ও ভয়ংকর কথা। এসবের মধ্যেও মেধা ও শক্তির সমন্বয় সাধন হলেই নারীসমাজ পুরুষের কব্জা থেকে নিষ্কৃতি পাবে, নচেৎ ইহকালেও সম্ভব নয়।

আইন হচ্ছে রাষ্ট্রের পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক অধ্যায় যা জনগণের জন্য হিতকর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে সূর্যাস্ত আইন, যা জমিদারি আইন (১৭৯৩) হিসেবে পরিচিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা প্রদান না করলে জমিদারের সম্পদ নিলামে বিক্রি করে দিত সরকার। জমিদারদের নিগৃহীত মনোভাব ও সরকারি আইনি প্রয়োগ এবং পূর্বসিদ্ধান্ত মিশ্রব্যবস্থপনা তৈরি করে প্রসঙ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যাস্ত আইনের প্রধান বিষয় হলো মেয়েদের যাতায়াত লঘু করা। যাতে সূর্যাস্তের মধ্যে তারা হলে প্রবেশ করে। হলের অভিভাবকও পুরুষ। যাদের ইচ্ছে সূর্যাস্তের পরপর যেন মেয়েরা হলে প্রবেশ করে নিজেদের নাম এন্ট্রি করে এবং দায়িত্বশীলদের চিন্তামুক্ত রাখে। জমিদারি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র তখন খাজনা আদায়ের আইনি জটিলতা প্রয়োগ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় একই ধারায় নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে।

> "যেদিন সমস্ত হলগুলো ভেঙে ফেলে সেখানে গর্ত সৃষ্টি করে ত্যালাপিয়া মাছের চাষ করা হবে, সেদিন বন্ধ হবে সন্ত্রাস, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত মেয়েদের আত্মরক্ষা করা শিখতে হবে।"[৪]

দেশের সর্বত্র যখন আনকন্ট্রোল কুষ্ঠ রোগে আচ্ছন্ন তখন মেয়েদের খোয়াড়ে রাখাই যেন মূল কাজ। বাহ্যিক জগতে থাকা হিংস্র ও লোলুপ মানুষগুলো নিজেদের জিভ, লালা আটকে রাখতে পারে না; বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা কন্ট্রোলের চিন্তায় খুব সজাগ। যেসব মেয়ে গ্রাম ও মফস্বল শহর থেকে এসেছে, যাদের মনোবল ও দৃঢ়চিন্তা, স্বপ্ন এবং দায়িত্ববোধের কারণে। কিন্তু এসব কিছুর মাধ্যমে মনে হচ্ছে তাদের মনোবলকে কুক্ষিগত করা, জান-মান হারাবার ভয় লাগানো। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে প্রচণ্ড গলদ বিদ্যমান। যারা পড়াশোনা করতে এলো তাদের কাছে দিন-রাত সমান। পড়াশোনা করতেই সময় ব্যয় হয়। তাদের মূল লক্ষ্য পড়াশোনা। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রভোস্টদের। শিক্ষার্থী মেয়েদের চরিত্র ও মনের স্ফুরণ, জীবনবোধ, ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ, অভিভাবকদের মূল্যবোধের প্রতি সম্মান, শালীনতাবোধ চর্চার জন্য ক্লাস ওয়র্কশপ, সেমিনার, কাউন্সেলিং গ্রুপ, এক্সপ্লোরেশন গ্রুপ, কনটিনিউয়াস অ্যাওয়ারনেস পোগ্রাম করা উচিত। মন ও মানসিকতা ঠিক হলে সূর্যাস্ত আইন নিষ্প্রয়োজন। দলছুট ছেলেমেয়ে সব সমাজে আছে কিন্তু তাদের কারণে শত শত শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা হরণ করা অসমীচীন। বরং সূর্যাস্ত আইন তুলে নিয়ে লাইব্রেরি ওয়ার্কসহ গঠনমূলক প্রশিক্ষণে নিজেদের ব্যস্ত রাখার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা কল্যাণকর হবে। তবেই মানুষের মুক্তি।

নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় পুরুষকে তৃপ্তিদান ও সন্তান উৎপাদন করা। পাশাপাশি ঘরকন্না হিসেবে মূল্য দেবার ঝোঁকও বিদ্যমান। পুরুষ জাতির শখ পুত্রসন্তানের। পুত্রসন্তান জন্ম না দিলে সারা বাড়িতে অসুখ অর্থাৎ ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। জ্বর নয় সংসারময় পুত্র লাভের মাতম। এ দেশে পুরুষ আদিম যুগ থেকে পুত্রসন্তানের জন্য লালায়িত। 'হা পুত্র হা পুত্র' অংশে গেদুর সাতটি পাগলা পুত্রের কথা ইঙ্গিত করে পুত্রসন্তানের কদর ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। পুত্রসন্তান ছাড়া এ জাতির কোনো ছাড়াছাড়ি নেই। পুত্রসন্তান জন্ম না দেওয়া পর্যন্ত জরায়ুর নিস্তার নেই। ধারণা করা হয় পুত্রসন্তান কুল রক্ষা করে। পুত্রস্নেহে সংসারের সৌন্দর্য রক্ষা পায়। তারা মনে করে তার মৃত্যুর পর বংশের বিলোপ হবে। মেয়ে আপনার বংশের এক্সটেনশন সে কথা কে শোনে? ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুফিয়া আক্তার চারটি কন্যাসন্তান জন্ম দেবার পর ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করেছে। ক্রোমজোমের কারণে তার এমন হয়েছে। কিন্তু সে যদি পাশের বাড়ির ক্রোমজোম নিত তাহলে পুত্রসন্তান হওয়া স্বাভাবিক ছিল। হিতাহিত বোধের অভাবে নারীর প্রতি অবমাননা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতা এক্ষেত্রে নিরুপায়। ধর্ষিতা ইয়াসমিন, ইউপি সদস্য রৌশনারা বেগম, শ্রমিক সীমারাণী, নিরীহ মেয়ে ইয়াসমিন, শেলী, ধর্ষিতা শেফালী, প্রীতিলতা ভট্টাচার্য, সুফিয়া আক্তার, শাজনীন ইত্যাদি চরিত্র *নারী : বিদ্রোহী* গ্রন্থে নানা ভাষ্যে নিপুণ মনোবিদ ও লেখকসুলভ ভঙ্গিতে স্থান পেয়েছে। বাঙালি নারীর প্রতিকূলতা কাটাতে তাঁর লেখনীভাষ্য সংগতিপূর্ণ। সৃষ্টিশীলতার Her nothing for God-এর ল্যু সালোমের সত্তায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ইউরোপীয় মিথ চর্চার সময়ে প্রশংসিত ও বিতর্কিত হয়েও দুটো আদর্শের ভার বহন করেছেন - ১) স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া, ২) নারী হিসেবে জন্মালেও জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে মানুষ ও নারী অধিকারের স্বীকৃতি। নারীর সংসারজীবনের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সামলানো যথারীতি

একটি যুদ্ধ তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। নারীর সাহসিকতা, দৃঢ়তা, নিরাপত্তা সমান্তরাল রেখা তৈরির প্রকৃত ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন নারী একা নয়, অন্যগ্রহের জীবন নয়, জনমানুষের মধ্যে একজন দায়িত্বসচেতন মানুষ। কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারীদের হীনম্মন্যতা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন। সমান্তরাল জীবন প্রত্যাশী তিনি। নারী জীবনের গভীর সত্যকে তুলে ধরা তাঁর লেখকসত্তার চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। নারী জীবনের কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা ও নিপীড়ন বাস্তবতার আদলে গ্রথিত। তাঁর বিশ্লেষণ ও নারী সমীক্ষা উপস্থাপনে মনে হচ্ছে নারী জীবনকে মর্যাদা ও অহংকারের সঙ্গে দেখেন। ভাষাবোধ ও ঘটনার সন্নিবেশ দেখে মনে হতে পারে তিনি সব ঘটনার রাজসাক্ষী। মূলত তিনি পেশাগত জীবনে মনোবিশ্লেষণী লেখক হিসেবে ঘটনা, ভাষাশৈলী ও নির্দিষ্ট অনুষঙ্গের মাধ্যমে আঘাত করতে চেয়েছেন। তাঁর নারীবোধ হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বের ধ্বনি।

Reference:

১. ব্যবহৃতা, আনোয়ারা সৈয়দ হক, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৫
২. পাতাদের সংসার, হারুন পাশা (সম্পাদিত), মে ২০১৯, ঢাকা।
৩. বাঙালি নারী ও সাহিত্য সমাজ, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৭৯
৪. নারী : বিদ্রোহী, আনোয়ারা সৈয়দ হক, জোনাকি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১৩

Bibliography:

আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী ও সাহিত্য সমাজ,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০
ইদ্রিস আলী, মুহম্মদ, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
ইকবাল, ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-'৭১),* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১
খান, রফিকউল্লাহ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭
ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলাদেশের সাহিত্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১
মুসা, মনসুর, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪
সৈয়দ হক, আনোয়ারা, *নারী বিদ্রোহ,* জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
হোসেন, সৈয়দ আকরম, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭